বিজ্ঞান

- ফরিদ আহমেদ

ওয়ার্মহোল এবং সময় পরিভ্রমণ

কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী *ইরন*–এ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলা নিয়ন্ত্রনহীন একটি মহাকাশযান যখন বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে অনিবার্য সংঘর্ষে ধ্বংস হওয়ার মুখে, সেই মুহূর্তে এর অভিযাত্রীরা মহাকাশযানে রক্ষিত প্রতি–পদার্থকে (Anti-matter) ব্যবহার করে পদার্থ, প্রতি–পদার্থের ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুতে অচিন্তনীয় ভরকে কেন্দ্রীভূত করে স্থান ও সময়ের ক্ষেত্রকে ছিন্ন করে তৈরি করে ফেলে ওয়ার্মহোল (Wormhole) যার মধ্য দিয়ে মহাকাশযানকে চালিয়ে নিয়ে তারা পৌছে যায় ভিন্ন এক সময়ের অন্য এক মহাবিশ্বে।

শুধু মুহম্মদ জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশনেই নয়, বিশ্বের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ও ছায়াছবিতে স্থান পেয়েছে সময় পরিভ্রমণের রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর বিষয়টি। এইচ জি ওয়েলস থেকে শুরু হলে হাল আমলের কার্ল সাগান পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর জগতে সময় পরিভ্রমণ আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

আসলেই কি সময় পরিভ্রমণ সম্ভব? এর কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? নাকি পুরোটাই কল্পবিজ্ঞান কাহিনীকারদের লাগামহীন কল্পনার ফসল? কেবল পাঠক আবেদনের কারণেই তাদের কাছে এটি একটি সাধারণ আকর্ষণীয় বিষয়? না, শুধু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকারদের কাছেই নয়, অনেক দিন ধরেই বিজ্ঞানীদের কাছেও সময় পরিভ্রমণের বিষয়টি আকর্ষণীয় চিন্তার খোরাক হয়ে রয়েছে।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই তত্ত্বে সময়কে শুধু সদা প্রবাহমান একক অস্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা না করে বরং একে স্থানের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে আরো জটিল ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ধরা হয়েছে। যেহেতু স্থান এবং সময় একই সত্তার অংশ, কাজেই সময় পাড়ি না দিয়ে স্থান পাড়ি দেয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের একটি বিস্ময়কর দিক হচ্ছে, এই তত্ত্ব অনুযায়ী গতিশীল ঘড়ির সময় স্থির ঘড়ির চেয়ে তুলনামূলকভাবে ধীরে চলে। একে বলে সময়ের ধীরতা বা টাইম ডাইলেশন সূত্র (Principal of time dilation)। ঘড়ি যতো গতিশীল হবে, সময় ততো ধীরলয়ে চলবে। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মিশিও কাকু (Michio Kaku) বিশ্বাস করেন, মহাকাশ অভিযান একদিন সময়ের রহস্যময়তা উন্মোচন করবে। এর জন্য প্রয়োজন এমন একটা মহাকাশযান যেটা প্রায় আলোর কাছাকাছি গতিতে ছুটতে পারবে। এরূপ গতিতে ছুটতে থাকা মহাকাশ যান প্রকৃতপক্ষে সময়ের গতিকে ধীর করে দেবে।

১৯৭৫ সালে মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির (University of Maryland) অধ্যাপক ক্যারল অ্যালি (Carol Allie) দুটি সমন্বিত আণবিক ঘড়ির সাহায্যে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রমাণ করেন। একটি ঘড়িকে উড্ডয়নশীল বিমানে কয়েক ঘণ্টা রাখা হয় এবং অন্য ঘড়িটিকে এয়ারপোর্টের ভূপৃষ্ঠে রাখা হয়। উড্ডয়নশীল বিমানটি ফিরে আসার পর দেখা যায়, বিমানে রক্ষিত ঘড়িটি ভূপৃষ্ঠের ঘড়িটির তুলনায় সামান্য ধীর গতিতে চলছে। পরীক্ষাটি অসংখ্যবার করার পরও যখন একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেল তখন নিশ্চিত হওয়া গেল, এই ধীরলয় পরীক্ষণের ত্রুটির কারণে হয়নি। সত্যি সত্যি গতির কারণে ঘড়ি সময় হারিয়েছে।

সময়ের এই ব্যবধান মহাকাশ স্টেশনে আরো প্রকট। কারণ এখানে বস্তুর গতি আরো দ্রুত এবং বিমানের তুলনায় এখানে আরো অধিক সময় বস্তুটি পরিভ্রমণ করছে। টাইম ডাইলেশন সূত্রে একটি অদ্ভুত ফল হচ্ছে, টুইন প্যারাডক্স (Twin Paradox)। ধরা যাক, একই চেহারার দুজন যমজের যে কোনো একজনকে প্রচণ্ড গতিতে মহাকাশে পাঠানো হলো। যেহেতু সে প্রচণ্ড গতিতে ভ্রমণ করছে, *গতিশীল ঘড়ি ধীরে চলে* মূল সত্য অনুযায়ী মহাকাশযানের ঘড়ির সময় ধীর হয়ে যাবে, কাজেই এ ব্যক্তি যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবে, তাত্ত্বিকভাবে তখন সে তার যমজের চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সে মহাকাশে পাচ বছর অবস্থান করে এবং আলোর গতির ৯৯.৫ ভাগ গতিতে চলে তাহলে তার এই পাচ বছরে পৃথিবীতে সময় অতিক্রান্ত হবে ৫০ বছর।

এখন আমরা জানি, প্রচণ্ড গতিতে ভ্রমণ করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে পরিভ্রমণ সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মহাকাশযানে বছরের পর বছর না থেকেও কিভাবে মোটামুটি বেশ খানিকটা সময় অতিক্রম করা যায়। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে ওয়ার্মহোল।

১৯১৬ সালে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পর পরই ভিয়েনার এক অখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী লুডিউইগ ফ্লাম সোয়ার্জচাইল্ড কৃষ্ণ গহ্বর (SchworzschildBlack hole) নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন, আইনস্টাইনের সমীকরণের দ্বিতীয় সমাধান সম্ভব যা বর্তমানে শ্বেত গহ্বর (Whitehole) নামে পরিচিত। শ্বেত গহ্বর ও কৃষ্ণ গহ্বর স্থান এবং কালের (Space-time) দ্বারা সংযুক্ত। কৃষ্ণ গহ্বরের *প্রবেশদ্বার* (Entry) এবং শ্বেত গহ্বরের *বহির্গমন* (Exit) একই মহাবিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা আলাদা মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। ১৯৩৫ সালে আইনস্টাইন এবং নাথান রোসেন একটি গবেষণা প্রবন্ধে অন্তঃ ও আন্তঃমহাবিশ্বের সংযোগ তত্ত্বের ওপর আরো আলোকপাত করেন যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈদ্যুতিক রৈখিক শক্তির মাধ্যমে গঠিত স্পেসটাইম টানেলের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক কণিকাগুলো যেমন ইলেকট্রনকে ব্যাখ্যা করা। এটিই আইনস্টাইন–রোসেন বৃজ (Einstein-RosenBridge) নামে পরিচিত। পরে পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার এর নামকরণ করেন ওয়ার্মহোল।

ওয়ার্মহোল হচ্ছে চতুর্মাত্রিক স্থান–কালের (Four dimentional space-time) মাঝখানে তৈরি গর্ত যা সংযোগ সাধন করেছে দুটি ভিন্ন স্থান ও সময়কে। ওয়ার্মহোলের দুটি মুখগহ্বর (Mouth) থাকে যা একটি সাধারণ কণ্ঠ (Throat) দিয়ে সংযোজিত। পদার্থ ওয়ার্মহোলের এক মুখগহ্বর দিয়ে প্রবেশ করে কণ্ঠের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে অন্য মুখগহ্বর দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। অন্তঃ বৈশ্বিক ওয়ার্মহোল একই মহাবিশ্বের দুটি অবস্থানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। পক্ষান্তরে আন্তঃবৈশ্বিক ওয়ার্মহোল এক সমান্তরাল মহাবিশ্বের (Parallel universe) সঙ্গে অন্য মহাবিশ্বের সংযোগ সাধন করে। সহজভাবে বলা যেতে পারে, ওয়ার্মহোল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুটি স্থান বা দুটি ভিন্ন সময়ের মধ্যে শর্টকার্ট রাস্তা হিসেবে কাজ করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওয়ার্মহোলকে ভ্রমণের বা বার্তা পাঠানোর কাজে ব্যবহার করা মোটামুটি অসম্ভব কাজ। কেননা যে কোনো পদার্থ বা শক্তি এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে সেগুলো তাদের মহাকর্ষীয় বলের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। ওয়ার্মহোলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম তখনই সম্ভব যদি কোনোভাবে ওয়ার্মহোলের মুখগহ্বরকে সংকেত বা মহাকাশযান অতিক্রম করা পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা যায়।

১৯৮৭ সালে ক্যালটেকের (ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি) তিন বিজ্ঞানী মাইকেল মোরিস (Michael Moris), কিপ থোর্ন (Kip Thorne) এবং ইউরি ইয়ের্টসেভার (Uri Yurtsever)–এর একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর ভ্রমণযোগ্য (Traverable) ওয়ার্মহোলের প্রতি আগ্রহে গতি সঞ্চারিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সায়েন্স ফিকশন লেখক কার্ল সাগান (Carl Sagan) তার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী *কন্টাক্ট* (Contact)–এর নায়িকাকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে আন্তঃনক্ষত্রিক দূরত্বে কিভাবে পাঠানো যায় তার উপায় বাৎলে দেয়ার জন্য কিপ থোর্নকে অনুরোধ করেন। থোর্ন সমস্যাটি তার দুজন পিএইচডি–র ছাত্র মাইকেল মোরিস এবং ইউরি ইয়ের্টসেভার–কে সমাধান করতে দেন। বিজ্ঞানীত্রয় উপলব্ধি করেন যে, যদি কোনোভাবে ওয়ার্মহোলের মুখগহ্বরকে মহাকাশযান অতিক্রম করা পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা যায় তাহলেই এ ধরনের পরিভ্রমণ সম্ভব।

থোর্ন, মোরিস এবং ইয়ের্টসেভার উপসংহারে পৌছান এই বলে যে, ওয়ার্মহোলের মুখগহ্বরকে উন্মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ঋণাত্মক শক্তি ঘনত্ব (Negative energy densit) এবং সুবিশাল ঋনাত্মক চাপ (negative Pressure)। ঋণাত্মক শক্তি ঘনত্বের এই অনুমিত পদার্থকে বলা হয় *অনুপম* পদার্থ (Exotic matter)। যদিও অনুপম পদার্থের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ আছে, তবুও এটা সত্যি, কাসিমির এফেক্ট (Casimir Effect)-এর মাধ্যমে নেগেটিভ শক্তি ঘনত্ব উৎপাদন করা সম্ভব। ওয়ার্মহোলের উৎস হিসেবে র্থোন, মোরিস এবং ইয়ের্টসেভার তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন কোয়ান্টাম ভ্যাকুয়াম বা শূন্য অবস্থার ওপর। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্যতা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কোয়ান্টাম বা অতি ক্ষুদ্র পর্যায়ে শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্যতা নয়। শূন্যতার মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে অবিরাম ক্রিয়া–প্রক্রিয়া। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে এক মুহূর্তেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে (Vacuum fluctuation) তৈরি হচ্ছে পদার্থ কণা, পরবর্তী মুহূর্তেই তা আবার মিলিয়ে গিয়ে পরিণত হচ্ছে শক্তিতে।

প্রকৃতির এই পর্যায়ে ধারণা করা হয়, প্রতি মুহূর্তেই তৈরি হচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ওয়ার্মহোল এবং তা বিলীনও হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের মাঝেই। তাদের মতে, উন্নত কোনো সভ্যতা শক্তি যোগ করে অতি ক্ষুদ্র ওয়ার্মহোলকে সম্প্রসারিত করে মাইক্রোস্কপিক আকারে নিয়ে যেতে পারে এবং পরে কাসিমির এফেক্ট ব্যবহার করে ওয়ার্মহোলকে স্থিতিবস্থা দিতে পারে। অবশেষে মুখগহ্বরদ্বয়কে মহাকাশের অতি দূর প্রান্তের দুটি এলাকার মধ্যে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও ভ্রমণ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো মহাকাশযানের মধ্যে স্থাপিত ওয়ার্মহোলের এক প্রান্ত দিয়ে যাত্রা শুরু করে অনেক আলোক বর্ষ দূরের অন্য কোনো প্রান্তে হাজির হয়ে যাওয়া যেতে পারে।

মজা হচ্ছে, টাইম ডাইলেশন সূত্রের কারণে এ ভ্রমণে খুব বেশি সময়ও লাগবে না। এমনকি পৃথিবীর সময় অনুযায়ীও নয়। ধরা যাক, ওয়ার্মহোলের এক প্রান্ত রয়েছে প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন কোনো মহাকাশযানে এবং অন্য প্রান্ত অবস্থান করছে পৃথিবীতে অথবা পৃথিবীর কাছাকাছি কোথাও। আলোর গতির ৯৯.৯৯৫ ভাগ গতিতে (সময়ের ধীরতা ফ্যাক্টর একশ ভাগ ধরে নিয়ে) মহাকাশযানটি পচিশ আলোক বর্ষ দূরের ভেগা (Vega) নক্ষত্রের দিকে যাত্রা শুরু করলো। মহাকাশ যানের সময় অনুযায়ী এই ভ্রমণে সময় লাগবে মাত্র তিন মাস। যেহেতু ওয়ার্মহোলের এক প্রান্ত পৃথিবীতে বা পৃথিবীর কাছাকাছি কোথাও রয়েছে সেহেতু পৃথিবীতেও এই সময় দেখাবে তিন মাসই।

মোরিস, থোর্ন এবং ইয়ের্টসেভারের সময় পরিভ্রমণের এ পদ্ধতি অবশ্যই কারিগরি ত্রুটির ঊর্ধে নয়। এর মধ্যে অন্যতম বড় ত্রুটি হচ্ছে ওয়ার্মহোলের মুখকে উন্মুক্ত রাখার জন্য যে অবিশ্বাস্য শক্তির প্রয়োজন তা এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার চেষ্টাকারী যে কেউ বা যে কোনো কিছুকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে।

এটা স্বীকার্য, আমাদের বর্তমান প্রযুক্তিতে ওয়ার্মহোল তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু মহাবিশ্বে ইতিমধ্যেই ওয়ার্মহোলের অস্তিত্ব থাকার বিষয় নিয়েও নানান ধরনের ধারণা উকিঝুকি মারা শুরু হয়ে গেছে। এর একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, হয়তো এই গ্যালাক্সি বা অন্য কোনো গ্যালাক্সির আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান ও সভ্যতায় অগ্রগামী কোনো প্রাণীরা ইতিমধ্যেই মহা বিশ্বব্যাপী ওয়ার্মহোলের নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছে। অন্য সম্ভাবনাটি হচ্ছে, আপনাআপনিই প্রকৃতিগতভাবেই মহা বিশ্বে ওয়ার্মহোল থাকতে পারে। ভান্ডেবিল্ট (Vandebilt) ইউনিভার্সিটির ডেভিড হোচবার্গ (David Hochberg) এবং থমাস কেফার্ট (Thomas Kefart) আবিষ্কার করেছেন, মহা বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায় মহাকর্ষীয় বল ঋণাত্মক শক্তির ক্ষেত্রগুলোর জন্ম দিয়ে থাকতে পারে যা থেকে প্রকৃতিগত, স্ব-স্থিতিবাচক ওয়ার্মহোল তৈরি হতে পারে। বিং ব্যাং বা মহা বিস্ফোরণের ফলে তৈরি এসব ওয়ার্মহোল হয়তো আমাদের অজ্ঞাতসারে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চুপি চুপি হয়তো কোনোটি মহা বিশ্বের কাছের কোনো জায়গাকে আবার কোনোটি হয়তো বা অচিন্তনীয় কোনো দূরের জায়গাকে সংযুক্ত করে বসে আছে।

সময় পরিভ্রমণ, বিশেষ করে অতীতে ভ্রমণ বড় ধরনের জটিলতা বা প্যারাডক্স তৈরি করতে পারে। অসংখ্য যুক্তি দাড় করানো হয়েছে অতীতে সময় পরিভ্রমণের বিপক্ষে। অতীতে পরিভ্রমণের বিপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হচ্ছে স্বয়ম্ভূ নীতি (Autonomy principle) বা গ্রান্ডফাদার প্যারাডক্স (Grandfather paradox)। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি অতীতে গিয়ে তার বাবারও জন্মের আগে দাদাকে হত্যা করে ফেললো। যেহেতু তার বাবা জন্ম হচ্ছে না কাজেই ওই ব্যক্তির জন্ম হচ্ছে না। তাহলে তার অস্তিত্ব কিভাবে আসছে। আর যদি অস্তিত্বই না থাকে তাহলে সে কিভাবে অতীতে যাচ্ছে? এ ক্ষেত্রে তাহলে তাকে ঈশ্বরের মতো স্বয়ম্ভূ হতে হবে।

অন্য আর একটি যুক্তি হচ্ছে কালানুক্রম নীতি (Chronologyprincpile)। এই নীতি অনুযায়ী সময় পরিভ্রমক বর্তমান থেকে অতীতে তথ্য নিয়ে যেতে পারে যা ব্যবহার করে নতুন ধারণা বা নতুন জিনিস তৈরি হতে পারে যাতে কোনো সৃষ্টিশীল কর্মক্ষমতার প্রয়োজন পড়ছে না। মনে করা যাক, পাবলো পিকাসো তার সমস্ত ছবি, ভাস্কর্য নিয়ে হাজির হলো তার কিশোর বয়সের নিজের কাছে। কিশোর পিকাসো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নিখুতভাবে সব কিছুর নকল করে ফেললো। কিন্তু এক্ষেত্রে তৈরি হয়ে গেছে অসম্ভব জটিলতা। নকল ছবি এবং ভাস্কর্যের অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ সেগুলো নকল করা হয়েছে নকল থেকে। ফলে দেখা যাচ্ছে, পিকাসো-র এই সমস্ত মাস্টারপিস তৈরি করতে কোনো সৃষ্টিশীল কর্মক্ষমতার প্রয়োজন হচ্ছে না।

স্টিফেন হকিং (Stephen Hilking)-এর মতে, ওয়ার্মহোল হয়তো তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু তা সময় পরিভ্রমণে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না, এমনকি *অনুপম* পদার্থ দিয়ে ওয়ার্মহোলকে স্থিতিবস্থায় আনা সত্ত্বেও। তিনি যুক্তি দেন, ওয়ার্মহোলে যে কোনো বস্তুকণিকা প্রবেশ করানো মাত্রই এটি এতো দ্রুত অস্থিতিবস্থায় চলে যাবে, এর মধ্য দিয়ে কোনো কিছুই অতিক্রম করানো সম্ভবপর হবে না।

সময় পরিভ্রমণের প্যারাডক্সের সমাধানে এগিয়ে এসেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ডেভিড ডিউশসহ (David Deutsch)-সহ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী। কোয়ান্টাম তত্ত্বের এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমান্তরাল (ParallellUniverse) বা বহু বিশ্ব (Multiverse) এবং বিকল্প ইতিহাস (Alternate histories) নিয়ে হাজির হয়েছেন তারা। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি সম্ভাব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি করে মহা বিশ্ব বিদ্যমান। প্রতিটি সমান্তরাল মহা বিশ্বই আমাদের মহা বিশ্বের মতোই প্রকৃত বাস্তব। যখনই কোনো ঘটনার একাধিক পরিণতি থাকে, তখনই প্রতিটি পরিণতির জন্য তৈরি হয় এক একটি মহা বিশ্ব। প্রতিটি সম্ভাব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে জন্ম নেয় এক একটি বিকল্প ইতিহাস। সিদ্ধান্ত বিন্দু (DecisionPoint) থেকে বিভক্তির মাধ্যমে শাখা বিস্তার করে তৈরি হয় অসীম সংখ্যক বিকল্প ইতিহাস। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন আপনি টাইম মেশিনে করে অতীতে গিয়ে নিজের জন্ম রোধ করে আসেন তখন মূলত আপনি সেই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নতুন একটি বাস্তবতা তৈরি করেন যে বাস্তবতায় আপনার কখনোই জন্ম হয়নি। ঠিক একইভাবে আপনি যখন ভবিষ্যতে ভ্রমণ করেন তখনো আপনি বাস্তবতার নতুন শাখায় চলে যান।

জটিল, তাই না? সময় পরিভ্রমণ আসলেই জটিল বিষয়। আমাদের বর্তমান জ্ঞান সময় পরিভ্রমণের বাস্তবতার চেয়ে পিছিয়ে আছে যোজন যোজন। তবে হয়তো এমন দিন আসবে যখন সময় পরিভ্রমণ হয়তো আলাদা কোনো তাৎপর্যই বহন করবে না। জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষে সময় পরিভ্রমণ হয়ে দাড়াবে পানির মতো সহজ কোনো কাজ। ইচ্ছা করলেই নিমিষে আপনি চলে যেতে পারবেন ১৯৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে। নিজ চোখে দেখে আসতে পারবেন ভারতবর্ষের ইতিহাস বদলের পালা অথবা চলে যেতে পারেন আরো অতীতে, বোধিবৃক্ষের নিচে দাড়িয়ে শুনে আসতে পারেন গৌতম বুদ্ধের বাণী বা দেখে আসতে পারেন হেমলকের ক্রিয়ায় নীল হয়ে যাওয়া সক্রেটিসের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মৃত্যু কিংবা চলে যেতে পারেন দূর কোনো ভবিষ্যতে যেখানে নেই কোনো যুদ্ধবাজ বুশ, ব্লেয়ার, সাদ্দাম বা লাদেন। হিংসা, বিদ্বেষ আর হানাহানিকে জাদুঘরে স্থান দিয়ে, সেখানকার মানুষেরা গড়ে তুলেছে প্রেম–প্রীতি ও ভালোবাসায় সিক্ত মায়াময় স্বপ্নের জগৎ।

উইন্ডসর, অন্টারিও, কানাডা
farid300@gmail.com